নতুন
সমাজ
নতুন
মানুষ
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ২০১৭

প্রকাশক

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

কেন্দ্রীয় কমিটি

২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা—১০০০

ফোন: ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭৫৭-৮০৮৭৮১

ই-মেইল: studentfront1984@gmail.com

মূল্য: ৫ টাকা

আমাদের কথা

সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক নতুন সমাজের জন্ম দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। বাধাহীনভাবে খুলে গিয়েছিল মানুষের বিকাশের সমস্ত পথ, মানুষ খুঁজে পেয়েছিল তার বাঁচার সার্থকতা। সৃষ্টি হয়েছিল নতুন মানুষ, নতুন সমাজ।

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শততম বার্ষিকী এ বছর। ১৯১৭ সালে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বুকে ঘটেছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের। মার্কস-এঙ্গেলস শোষণহীন মানবসমাজের যে সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, রাশিয়ার বুকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তা বাস্তবে পরিণত করেছিল। আর লেনিনের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ নেই। তাহলে কি সমাজতন্ত্র ব্যর্থ? মার্কসবাদ কি তাহলে একটি অকার্যকর দর্শন? এ নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ বিভিন্ন দিক থেকে হয়েছে এবং চলছে অবিরাম। বিভ্রান্তি দূর করে প্রকৃত সত্যকে খানিকটা তুলে ধরার প্রত্যাশায় আমরা এই পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। খুবই অল্প কলেবরের মধ্যে বেশকিছু বিষয় আমরা তুলে আনার চেষ্টা করেছি, তাই বইটির অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। বইটি পড়ে উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠকদের মনে যদি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আরেকটু জানার ও বোঝার মনোভাব তৈরি হয় তবে আমাদের চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করবো। আপনাদের মতামত নিয়ে ভবিষ্যতে বইটিকে আমরা সমৃদ্ধ করতে চাই।

শুভেচ্ছাসহ

নাঈমা খালেদ মনিকা
সভাপতি

স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু
সাধারণ সম্পাদক

নতুন সমাজ নতুন মানুষ

'আপনারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন? সমাজতন্ত্র তো ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রে তো ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। ধর্ম পালনের অধিকার নেই।'

'সকলকে সমান করতে চায় সমাজতন্ত্র। কিন্তু সকলকে কি সমান করা যায়? হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান?'

'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিটাই তো অস্বাভাবিক। খাওয়া-পড়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আবার কেউ বেশি কাজ করলেও তার ব্যক্তিগত কোনো লাভ হবে না – এভাবে চললে তো মানুষের উদ্যোগ নষ্ট হবে।'

'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় তো কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি যা মনে করতো তাই হতো। কোনো নির্বাচন ছিল না, মানুষের মতের কোনো বালাই ছিল না। রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা ছিল অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী।'

এমন অনেক প্রশ্ন আজ সমাজতন্ত্রকে ঘিরে। এই প্রশ্নের তালিকা আরও দীর্ঘ করা যাবে। একসময় বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক শিবির আজ আর নেই। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও আজ দুর্বল। তবুও এ নিয়ে আলোচনা থেমে নেই। বিরুদ্ধ প্রচারণারও শেষ নেই। স্বাভাবিকভাবে তখন প্রশ্ন ওঠে, আজও এত বিরুদ্ধ প্রচারণা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা আমাদের বর্তমান সমাজটার দিকে চোখ ফেলতে চাই। কেমন চলছে আমাদের সমাজ? এ সমাজে মানুষ সুখে নেই, স্বস্তিতে নেই। অনেক আশা নিয়ে গড়ে তোলা পরিবারগুলো আজ নদীর পাড়ের মতো ভাঙছে। যত্নে গড়া স্বপ্নগুলো মারা যাচ্ছে এক এক করে। সামাজিক ব্যবস্থাটাই এমন যে, এখানে মনুষ্যোচিত জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় আয়োজন নেই। এক ভাগ লোকই বেশিরভাগ সম্পদের মালিক। বাকি নিরানব্বই ভাগ লোক সেই মালিকের মুনাফা অর্জনের জন্য যে কাজ করার, যে কথা ভাবার – তাই করছে, তাই ভাবছে। এ কারণে কাজে আনন্দ নেই। ভাবনায় সৃষ্টিশীলতা নেই। সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কগুলো আজ পরিণত হয়েছে স্বার্থের সম্পর্কে।

হৃদয়হীন এই সমাজে বাঁচতে গিয়ে প্রতিদিন হাজারো সমস্যায় জর্জরিত মানুষ তাই ভাবে, এরকম কি কোনো সমাজ হতে পারে, যেখানে জীবনের এত এত সব সংকট থেকে মুক্তির রাস্তা আছে? এক জাতির উপর আরেক জাতির, এক সম্প্রদায়ের উপর আরেক সম্প্রদায়ের, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার – এর কি কোনো শেষ নেই? শতকরা নিরানব্বই ভাগ লোকের উপর একভাগের শোষণের অবসান কি কখনও হবে? এই আর্তি আজ বিশ্বজুড়ে। আমেরিকা থেকে আরব, আফ্রিকা থেকে এশিয়া – কোথায় ফেটে পড়ছে না বিক্ষুব্ধ মানুষ? এই বিক্ষোভের মধ্যে পরিবর্তনের যে আকুতি, তাই-ই তাকে বারবার নিয়ে যাচ্ছে একটা নতুন আকাঙ্ক্ষিত সমাজের দিকে।

দর্শনের কাজ শুধু সমাজকে ব্যাখ্যা করা, নাকি তাকে পাল্টানোও?

সমাজের পরিবর্তন কীভাবে হবে? পরিবর্তন কারা করবে? – এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বহু দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রেখেছেন। এসব আলোচনায় অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এসেছে, এভাবেই সামাজিক পরিবর্তনের নানা কারণ তারা তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই কারণ অনুসন্ধান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়ার কারণে তারা অতীতের পরিবর্তনের নিয়মকে ধরতে পারেননি, সেগুলোকে সূত্রবদ্ধও করতে পারেননি। একইসাথে ভবিষ্যতে কীভাবে এ সমাজ আবারও পরিবর্তিত হবে তারও সঠিক

নির্দেশনা দিতে পারেননি। তবে সেই আলোচনাগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞান পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। মার্কসবাদই প্রথম দর্শন যেখানে সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত কিছুকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মার্কসবাদের আগের সমস্ত দর্শনই শুধুমাত্র সমাজকে ব্যাখ্যা করেছে, মার্কসবাদই প্রথম দেখিয়েছে – কীভাবে একে পরিবর্তন করা যায়।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মনোজগতে যেসব প্রশ্ন এযাবৎকালে এসেছিল, তার উত্তর দিয়েছে মার্কসবাদ। মার্কসবাদের উদ্ভব ঘটেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপের যখন শ্রেষ্ঠ সময়, সেই সময়কালে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে জার্মানির দর্শন, ইংল্যান্ডের অর্থশাস্ত্র এবং ফ্রান্সের সমাজতত্ত্বের চূড়ান্ত বিকাশের পর্বে তাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হিসাবে মার্কসবাদের জন্ম। সংক্ষেপে এর মূল বিষয়গুলোকে এভাবে তুলে ধরা যায় –

• মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এর মানে হলো – জগৎ বস্তুময়। প্রত্যেকটি বস্তু পরস্পর বিপরীত সত্ত্বার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। এই বিপরীত সত্ত্বার মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং এ কারণে বস্তুর অভ্যন্তরে গতির সৃষ্টি হয়। গতির কারণে বস্তুর রূপের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিমাণগত পরিবর্তন একসময় গুণগত রূপ পায়। ক্রমান্বয়ে একটি বস্তু সম্পূর্ণ নতুন একটি বস্তুতে পরিবর্তিত হয়। আবার গুণগত পরিবর্তন সামগ্রিক অর্থে পরিমাণগত পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

• বস্তুজগৎ মানুষের চিন্তা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। বস্তুজগতের সাথে মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান সৃষ্টি হয়।

• যেকোন সমাজে অর্থনীতি হলো ভিত্তি এবং রাজনীতি, দর্শন, মানবিক ভাবাবেগ সমস্ত কিছুই হলো উপরিকাঠামো। ভিত্তির প্রকৃতির উপর যেমন উপরিকাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তেমনি উপরিকাঠামোও কখনো ভিত্তির পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ দু'য়ের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক।

• মার্কসবাদ প্রথম দেখালো, প্রতিটি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমসময়ের উপর। মানুষের শ্রম ছাড়া জগতের কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের শ্রমও হয়েছে পণ্য। মজুরি শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করছে শ্রমের যন্ত্রের মালিকের কাছে। শ্রমিকের শ্রমের একটা অংশ ব্যয় হয় তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য, যার জন্য সে মজুরি পায়। আর আরেকটি অংশ ব্যয় হয় মালিকের জন্য, যেটা সে করে বিনা মজুরিতে। মার্কস এর নাম দিয়েছিলেন 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব'। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাকে একটা অনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত করেছে।

• মার্কসবাদ দেখিয়েছে, সমাজটা সবসময় একরকম ছিল না। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজকে পাল্টিয়েছে। মানব সভ্যতার শুরুতে ছিল আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। এই সমাজে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। যে অল্প পরিমাণ সম্পদ উৎপাদিত হতো তাই ভাগাভাগি করে কোনো রকমে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতো সেকালের মানুষ। উদ্বৃত্ত সম্পদ না থাকায় সঞ্চয়ের ভাবনাও আসেনি। ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাও আসেনি। তাই কোনো শ্রেণিও ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে আপেক্ষিক অর্থে সম্পদের পরিমাণ বাড়তে থাকে, কিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ তৈরি হয়। আর একদল লোক গায়ের জোরে সেই উদ্বৃত্ত সম্পদ দখল করে তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। মালিকানার প্রশ্নটি চলে আসার পর সম্পদের মালিকানাকে কেন্দ্র করে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে এই প্রথম পরস্পর বিপরীত দুটি শ্রেণির জন্ম হয়- দাস ও দাস মালিক শ্রেণি। দাস সমাজ পাল্টে হয় সামন্ত সমাজ, যেখানে ভূস্বামী/রাজা এবং ভূমিদাস নামের দুটি শ্রেণির জন্ম হয়। সামন্ত সমাজের গর্ভে বণিকী ব্যবস্থার সূচনা হয়। এই বণিকী ব্যবস্থা পরবর্তীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্ম দেয়। আবির্ভূত হয় পুঁজির মালিক এবং শ্রমিক – এই দুটি শ্রেণি। এই সমাজ পরিবর্তিত হয়ে একদিন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সমাজে কোনো শ্রেণি থাকবে না, শ্রেণি বৈষম্য থাকবে না, থাকবে না মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর শোষণ। তবে তেমন একটি

সমাজে যাবার আগে মানুষকে আরেকটি সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যার নাম সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রেও পুঁজিবাদের মতো শ্রেণি থাকে, কিন্তু শ্রেণিবৈষম্য থাকে না। ক্ষমতায় থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক শ্রেণি। সমাজতন্ত্রকে বলা হয় পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাবার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা।

বস্তুজগৎ ও সমাজ পরিবর্তনের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে পৃথিবীর দার্শনিকদের মধ্যে এতদিন ধরে যে অস্পষ্টতা-ধোঁয়াশা ছিল, মার্কসবাদী দর্শন তাকে দূর করে দিল। মার্কসবাদই প্রথম ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে দেখালো – সমাজবিকাশের ধারায় কীভাবে পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। আর সেই রাষ্ট্র যা এক শ্রেণি কর্তৃক আরেক শ্রেণিকে নিপীড়নের যন্ত্র মাত্র। এই রাষ্ট্রও কীভাবে ইহিতাসের গতিপথে একদিন বিলুপ্ত হবে, কোন শ্রেণি এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে – মার্কসবাদই এক্ষেত্রে একমাত্র সঠিক পথনির্দেশ করেছে।

সমাজতন্ত্র কি দিয়েছিল মানব সভ্যতাকে?

১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে রাশিয়া ছিল বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির অন্যতম। বিপ্লবের পরেও ক্ষমতা ধরে রাখা সহজ হয়নি, তার জন্য অশেষ মূল্য দিতে হয়েছে। বিপ্লবের পর ১৪টি দেশ মিলে রাশিয়া আক্রমণ করেছে। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র গৃহযুদ্ধতেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯২১-২২ সালে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এসব বাধা মোকাবেলা করে বিশ্বের দ্বিতীয় শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে রাশিয়া দাঁড়িয়েছিল ১৯৩৩ সালে। সংগীত, সাহিত্য, স্থাপত্য, খেলাধুলা – সবকিছুতেই বাধাহীন এগিয়ে যেতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েতের শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন তো দিতে হতই না বরং বেশিরভাগ ছাত্রকে বৃত্তি দেয়া হত লেখাপড়ার জন্য। শিক্ষা শেষে সকলেরই কাজের ব্যবস্থা ছিল। বেকার সমস্যাকে নির্মূল করতে পেরেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন যা আজ পর্যন্ত কোনো পুঁজিবাদী দেশ পারেনি। শ্রমিকদের দিনে সর্বোচ্চ আট ঘন্টা শ্রম দিতে হত, গড়ে তা ছিল সাত ঘন্টা। প্রতিবছর তারা বেতনসহ ছুটি পেত। অসুস্থ হলেও পুরো মজুরি পেত। মানবিক বিকাশের জন্য শ্রমিক-কৃষক সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য বিনোদনের আয়োজন অবারিত করেছিল। তাদের অবসর কাটানোর জন্য ছিল পর্যাপ্ত পার্ক, থিয়েটারসহ প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৮৫টি জাতি ও ১৪৭টি ভাষার মধ্যে কোনও একটা বিশেষ জাতি বা ভাষার কৃত্রিম প্রাধান্য ছিল না। যে সকল ভাষার লিপি নেই সেসকল ভাষার লিপি তৈরি করে দিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকল জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিকশিত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। তাই বই প্রকাশের সংখ্যাও ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুল। শুধু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একত্রে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও জাপান অপেক্ষা বেশি ছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত নয়টি শীতকালীন অলিম্পিকে অংশ নিয়ে ৭টিতেই সর্বোচ্চ পদক বিজয়ী হয়েছিল।

সমাজতন্ত্র কি একটা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা?

'জনগণের মতামতের কোনো তোয়াক্কা করে না সমাজতান্ত্রিক সমাজ' – সম্পূর্ণ ভুল এই ধারণা চলে আসছে বহুদিন ধরে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে জনপ্রতিনিধিরা শুধু নির্বাচিত হতেন তা নয়, যারা তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করত, তারা যেকোন সময় প্রতিনিধিদের 'রি কল' করতে পারত। অর্থাৎ প্রতিনিধিদের কারও উপর অনাস্থা তৈরি হলে ভোটাররা তাকে ফিরিয়ে নিতে পারত, তার বদলে অন্য কাউকে নির্বাচিত করতে পারত। বিচার বিভাগ, পুলিশ, মিলিটারি এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত সমস্ত পদাধিকারি নির্বাচিত হতেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিয়োজিতদের ভোটে। এমন ব্যাপক গণতন্ত্র আজকের কোনো পুঁজিবাদী দেশে ভাবাই যায় না। 'সোভিয়েত ব্যবস্থার' মাধ্যমে রাশিয়ার

শাসন পরিচালিত হত। এ ব্যবস্থাটা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বিভ্রান্তি জন্ম নেয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতসহ বিশ্বের যেকোন দেশের কথাই ধরি না কেন, সেখানে যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাতে মত প্রকাশের কতটুকু স্বাধীনতা আছে? গণতন্ত্রের যে প্রাথমিক শর্ত 'জনগণের মতামত' – তার কতটুকু প্রতিফলন এখানে ঘটে?

এই দেশগুলোতে টাকা, ক্ষমতা, মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। নির্বাচন সেখানে নাটকমাত্র। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, গণতন্ত্রের 'তীর্থস্থান' আমেরিকার নির্বাচন আমরা দেখছি না? কোনো ছোট দল কি সেখানে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিততে পারে? এর উত্তরের কোনো আবশ্যকতা নেই। ঐ সকল দেশে গণতন্ত্র বাস্তবে দ্বিদলীয় স্বৈরাচারী ব্যবস্থাই। অনেকে বলেন, এই দুটি দলকে তো জনগণই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। জনগণের মত যদি দুটি দলের পক্ষেই যায় তো কী করার আছে?

মনে রাখা দরকার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের 'মত' টাকেও উৎপাদন করা হয়। করা হয় বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে, বিভিন্ন ঘটনা সৃষ্টি করে। শুধু নির্বাচনী প্রচারই ধরুন। কী নেই তাদের নির্বাচনী প্রচারে? টাকা, মিডিয়া, পেশি শক্তি, উগ্র জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, সাদা-কালোর প্রভেদ, আঞ্চলিকতা সবকিছুই চলছে প্রবল উদ্যমে। এই-ই যদি সাচ্চা গণতন্ত্রের মডেল হয় – তবে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে সে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রে ছিল না। আর গণতন্ত্র যদি মানুষের মতের মর্যাদা দেয়ার প্রশ্ন হয়, তবে গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যেভাবে তৃণমূল পর্যন্ত চর্চায় নিয়ে গিয়েছিল, আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনো পুঁজিবাদী দেশ তা পারেনি। পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের ধারণাকে কেবল ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এটাকে হাস্যকর করে তুলেছে। আর ভোটের অবস্থাটাও কী করেছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কি এককভাবে দেশ পরিচালনা করত? ভিন্ন মতামতকে কি তারা গুরুত্ব দিত? আমাদের জানা দরকার যে, কমিউনিস্ট পার্টির কোন সিদ্ধান্তই দলের মধ্যে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক ছাড়া গ্রহণ করা হত না। এটা কমিউনিস্ট পার্টির একটা রীতির মধ্যে পড়ে। এটা শুধু দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে চালু ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়ন করার ঘটনার দিকে যদি আমরা তাকাই, তবে দেখব – একটা কমিশন গঠিত হয়েছিল সংবিধান প্রণয়নের জন্য। সে কমিশন এক বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে আলাপ আলোচনা করে একটা খসড়া দাঁড় করালো। এ পর্যন্ত সবকিছু অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই। কিন্তু এরপর শুরু হলো এক মহাযজ্ঞ। ১৯৩৬ সালে সরকার একটা প্রস্তাবিত খসড়া গ্রহণ করল। এই খসড়ার ৬ কোটি কপি জনসাধারণের কাছে পেশ করা হলো। ৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভায় মিলিত হয়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক সেটা নিয়ে আলোচনা করল। কয়েক মাস ধরে সোভিয়েতের প্রতিটি সংবাদপত্র ছিল নাগরিকদের চিঠিতে ভরপুর। ১ লক্ষ ৫৪ হাজার সংশোধনী প্রস্তাব এলো। এগুলোর বেশিরভাগই ছিল একই রকমের, আবার অনেকগুলো ঠিক সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে আইন হিসেবে প্রণীত হবার উপযুক্ত। কিন্তু তারপরও ৫৪টি সংশোধনী গৃহীত হলো।

ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার এই সংবিধানেই সংরক্ষিত ছিল। 'নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে বাঁচার অধিকার সংরক্ষিত হলো চারটি উপধারায়: কাজ করার অধিকার, ছুটি ভোগ করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও বাস্তব সাহায্য পাওয়ার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার ব্যাখ্যা করা হলো ছয়টি পরিচ্ছেদে: বিবেকের স্বাধীনতা; উপাসনার স্বাধীনতা; কথা বলার বা বক্তৃতা করার স্বাধীনতা; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; একত্র মেলামেশা, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সংগঠন করার স্বাধীনতা; যথেচ্ছা গ্রেফতার থেকে মুক্ত থাকা, গৃহ জীবন ও পত্রালাপে পূর্ণ স্বাধীনতা।

এই ছিল সোভিয়েতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া, এই ছিল সোভিয়েতের সংবিধান। তার প্রণয়ন প্রক্রিয়া যেমন পূর্ণ গণতান্ত্রিক, তেমনি যেসকল অধিকার একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত তার সবকিছুই ছিল এ সংবিধানে। আচ্ছা, আজকের পৃথিবীর নামকরা বিরাট বিরাট গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই গণতন্ত্র আছে কি?

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হত কি?

প্রচলিত কথা হলো, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত আগ্রহ ও মতকে জোর করে অবদমিত করা হয়। সাহিত্য, গান কোনোকিছুই স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করা যায় না। বিরুদ্ধ মত সরকার সহ্য করে না। এই যুক্তি মানলে আমাদের এও মানতে হয় যে, বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আইজেনস্টাইনকে তাহলে তার মতের বিরুদ্ধে জোর করে সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে বাধ্য করা হয়েছে! মায়াকোভস্কি সাহিত্য সৃষ্টির নামে পার্টির লিফলেট লিখে দুনিয়াজোড়া সম্মান কুড়িয়েছেন! স্তানিস্লাভস্কি গোটা দুনিয়ার নাটকের লোকেদের কাছে বিখ্যাত হয়ে আছেন স্রেফ কিছু পোস্টার মার্কা কাজ করে! বিশ্ববিখ্যাত বলশয় থিয়েটারের ততোধিক বিখ্যাত ব্যালেগুলো আসলে নির্মম কমিউনিস্ট শোষণের ফলাফলমাত্র, যা দেখে পল্লীকবি জসীম উদ্-দীন থেকে শুরু করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সবাই উচ্চস্বরে প্রশংসা করেছেন! ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন টিকে ছিল, ততদিন প্রায় সবকটি অলিম্পিকে আর কেউ সর্বোচ্চ পদক নিতে পারেনি, কারণ সেখানে ব্যক্তির বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টিকারী একটি শাসনব্যবস্থা ও সরকার ছিল! রবীন্দ্রনাথ, রমা রঁল্যা, বারট্রান্ড রাসেল, আইনস্টাইন, জর্জ বার্নার্ড শ সহ বিশ্বের বড় বড় মানুষেরা এই সমাজতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কারণ কী? কারণ হলো, সমাজতন্ত্র ব্যক্তির বিকাশের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল!

বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম নিকৃষ্ট মিথ্যা সৃষ্টির উৎকৃষ্ট মাধ্যম – আজকে এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে? সম্প্রতি, ইরাক-লিবিয়ার যুদ্ধে মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে, মিথ্যা-বানোয়াট অভিযোগ তুলে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে যুদ্ধ বাধালো, তা কি আমরা ভুলে গেছি? সমাজতন্ত্রকেও কুৎসিতভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলোর চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাই আমরা সমাজের সচেতন মানুষদের অনুরোধ করবো – যাচাই করে দেখুন, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের বক্তব্য আর বাস্তব ঘটনা মিলছে কি?

সমাজতন্ত্র মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে চেয়েছে, যাতে সকল মানুষ বেড়ে ওঠার সমান সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হয়। এ না হলে কারো ভেতরে যত গুণই থাকুক না কেন তা বিকশিত হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই ভূমিকার কারণে অনেকে মনে করেন তাহলে সমাজে কোনো বৈচিত্র্য থাকবে না। সকলে এক হয়ে যাবে। প্রথমত বোঝা প্রয়োজন, বৈষম্য আর পার্থক্য এক জিনিস নয়। সামাজিক বৈষম্য দূর করার কথা বলে সমাজতন্ত্র। কিন্তু মানুষে মানুষে বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য সেটা তো স্বাভাবিক। বেড়ে ওঠার, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হলে মানুষের এই আপন বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার পথ পায়। অর্থাৎ অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা আসলে বৈষম্য দূর হয়। আর বৈষম্য দূর হলেই বৈচিত্র্যগুলোও বিকশিত হয়।

অথচ বিপরীত প্রচারই ক্রমাগত চলে এসেছে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যেন সে সবাইকে যন্ত্র বানিয়ে দিতে চাইছে! শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-খেলাধুলা সকল ক্ষেত্রে এত এত সৃষ্টি – এসব যেন মেশিন থেকে বের করা! 'বলা হয় হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়। তাই এমন সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়, যেখানে সব মানুষ সমান হবে।' এটিও আরেকটি বহুল প্রচারিত অপপ্রচার এবং সত্যের বিকৃতি। মানুষের হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না ঠিকই কিন্তু পাঁচ আঙুলেই রক্তের প্রবাহ প্রয়োজনমতো থাকে। পুঁজিবাদ চার আঙুলে রক্তের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে এক আঙুলে সব রক্ত সরবরাহ করবার কথা বলে। পাঁচ আঙুলের আকৃতির বৈচিত্র্য থাকে বলেই যেকোন কিছু ধরা যায়, ভাত খেতেও পাঁচ আঙুলেরই ব্যবহার হয়। আমরা কখনোই বলি না যে, সমাজতন্ত্র সকল মানুষকে আক্ষরিক অর্থে সমান করে দেবে। সমাজতন্ত্র বলে না যে, সবাই একই কাজ করবে বা সব ক্ষেত্রে একই মেধা বা যোগ্যতার পরিচয় দেবে। বরং বলে সকলের সামনে সকল সামাজিক অধিকার ও সুযোগ সমানভাবে উপস্থিত থাকবে। ব্যক্তি মালিকানায় অল্প কিছু মানুষের হাতেই যে সকল সুযোগ-সুবিধা তাকে দূর করার কথা বলে।

পুঁজিবাদী দেশে পুঁজির প্রয়োজনে বা বেঁচে থাকার তাগিদে একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে সৃষ্টিশীল শিল্পচর্চা ছেড়ে ভাড়াখাটা শিল্পীতে পরিণত হতে হয়। একজন লেখক বা কবিকে সৃষ্টিশীল কাজ ছেড়ে দেবার বেদনা সইতে হয়, বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে পয়সার জন্য, টিকে থাকার জন্য, নোংরা বিষয়ে লিখতে হয়, পত্রিকা মালিকের বা প্রকাশকদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সস্তা জিনিস লিখে দিতে হয়। অভিনয় শিল্পীকে অভিনয়ের বদলে বাজারি রূপ দিতে হয়। মেধাবী বিজ্ঞানীকে মানব সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের বদলে মানুষ হত্যার গবেষণা করতে হয়। গবেষককে সৃষ্টিশীল বা সামাজিক প্রয়োজনের গবেষণা ছেড়ে পুঁজির ঠিকাদারী গবেষকে পরিণত হতে হয়। অধিকাংশ মানুষের জীবন টিকে থাকার সামগ্রী সংগ্রহেই কেটে যায় বলে মেধার বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগই থাকে না। সেই পুঁজির ধারক-বাহকরা যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাজারটা ভুল দেখানোর চেষ্টা করে তখন সেগুলো হাস্যকরই বটে। যারা এসব গল্প বানান, তাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না!

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বই, সিনেমা এগুলো কি সেন্সর করা হতো না? আলবৎ হতো। সেন্সর বোর্ড তো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই তৈরি করেছে। গণতন্ত্রের উদগাতারা যখন ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছেন, তখন তার সীমাও তারা নির্দেশ করে দিয়েছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে স্বাধীনতার সীমা ততটুকুই, যতটুকুতে তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগে। সেই সীমা লঙ্ঘন করলে, সমাজকে আঘাত করার দায়ে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা নেয়। সমাজতন্ত্রেও অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার ধারক বা শোষণকারীদের বিপক্ষে কখনও কখনও ব্যবস্থা নিতে হয়। এখন কোনো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে ভুল পদক্ষেপও নেয়া হয়ে থাকতে পারে, সেটা অসম্ভব কিছু নয়। সেটা সেই বিশেষ ঘটনা ধরে আলোচনা করার বিষয়। কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্তে অবান্তর যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কোনো প্রকার চিন্তার স্বাধীনতা দেয় না। চিন্তার স্বাধীনতা ছাড়া এমন মহৎ সৃষ্টি করা কি সম্ভব ছিল?

সমাজতন্ত্রীরা কি ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী?

যে কথাটা প্রথমেই স্পষ্ট করে বোঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। সমাজতন্ত্র কোনো মানুষকে নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনে বাধা দেয় না। কাউকে ধর্ম পালন করতে যেমন বাধা দেয় না তেমনি কেউ ধর্ম পালন না করতে চাইলে তাকে বাধ্যও করে না। ধর্ম নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, যার চর্চা হবে উপাসনালয়ে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মকে টেনে আনা সঠিক নয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সর্বাত্মক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নীতিই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি।

ইতিহাসের সকল ধর্ম ও ধর্মীয় প্রবক্তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে সমাজতন্ত্রীরা শ্রদ্ধা করে। কারণ প্রত্যেক ধর্মই শুরুতে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্রীরাও আজ দেশে দেশে মানুষের অধিকার আদায় থেকে শুরু করে সকল জাত-পাত-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক কাতারে দাঁড়িয়ে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের লড়াই করছে। সেই দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধর্মকে তার যথার্থ জায়গায় স্থাপন করেছে।

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে অনেকে 'ধর্মহীনতা' বা 'ধর্ম বিরোধিতা' বলে প্রচার করেন। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন – রাষ্ট্রের উৎপত্তির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল কি? ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘাটলে দেখা যাবে, বর্তমান সময়ের প্রচলিত অনেক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সৃষ্টির আগেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও রাষ্ট্র গঠনের চারটি প্রধান শর্তের কথা বলা হয়- নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনগোষ্ঠী, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। এখন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে একত্রে বসবাস করতে হলে, ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির মতো ধর্মও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র হয় না, তা আমাদের দেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাস

দেখলেও বোঝা যায়। কিন্তু তারপরও যারা রাষ্ট্রের গায়ে ধর্মের আলখাল্লা পরাতে চান, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে অস্বীকার করেন তারা আসলে ধর্মীয় সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিতে চান এবং এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা বিশ্বাসীদের উপর নানাভাবে খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র না থাকলে কী হয় তার বড় প্রমাণ বাংলাদেশে হিন্দুসহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর বর্তমান নিপীড়ন। দু'দেশেই ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি অংশ সংখ্যালঘুদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র না থাকলে সকল ধর্মের মানুষের তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনও অসম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদে সকল মানুষের জন্য সমানাধিকারের দাবি করা হয়, দাবি করা হয় সামাজিক মালিকানার। যারা সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষার পক্ষের লোক, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠকিয়ে কিছু লোকের বিরাট বড়লোক হয়ে ওঠার ব্যবস্থাকে যারা নিজেদের স্বার্থে টিকিয়ে রাখতে চান, তারাই সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতার সরাসরি বিরোধিতা করতে না পেরে ধর্মকে এসকল দাবির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। যেকোন পরিবর্তনের আন্দোলনকে গোড়াতেই থামিয়ে দিতে ধর্ম একটি সংবেদনশীল ও শক্তিশালী মাধ্যম। 'ধর্ম মানে না' – এই অভিযোগ তুলে যে কাউকে কোণঠাসা করা যায়, সাধারণ মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। এতে ধর্মের মহত্ত্ব বাড়ে না। বরং উগ্রতার হাতে পড়ে ধর্ম অপমানিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ধর্ম পালন করতে কি বাধা দেয়া হত? এখানে আমরা আমাদের দেশের বিখ্যাত কবি পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। তাহলে অপপ্রচার ও বাস্তবের পার্থক্য বোঝা যাবে। সোভিয়েত ভ্রমণের এক পর্যায়ে তাসখন্দের একটি মসজিদে গিয়েছিলেন তিনি। সেদিন ছিল জুম্মাবার। প্রায় আড়াই হাজার লোক সেদিন নামাজ পড়ার জন্য সেই মসজিদে জড়ো হয়েছিল। তিনি এর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু জায়গা ঘুরেছেন। সেখানে বিভিন্ন অধিবাসী, তাদের বিচিত্র ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং এসব ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি দেখেছেন। তাসখন্দের মসজিদে নামাজ শেষ হওয়ার পর তিনি দু'একজন নামাজীর সাথে কথা বললেন। কথা বললেন মসজিদের সহকারি মুফতির সাথে। ঘুরে দেখলেন মসজিদ সংলগ্ন ইসলামী গবেষণাগার। সেখানে কয়েকজন ছাত্র আরবীশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিল। গবেষণাগারে একটি ক্ষুদ্র মিউজিয়ামও ছিল। সেখানে হযরত ওসমানের নিজ হাতে লেখা একটি কোরান শরীফ সংরক্ষিত ছিল।

জসীম উদ্‌দীন দেশে ফিরে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, "সমাজতন্ত্রবিরোধী কোন কোন লোক আমাদের দেশে ঘটা করিয়া প্রচার করেন সোভিয়েত দেশে মুসল্লিদিগকে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না। মসজিদগুলি হয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা সেখানে গভর্নমেন্টের অন্যান্য অফিস বসিয়াছে। আমাদের অসাম্য-ভরা দেশে যদি কেহ জনগণের সুযোগ সুবিধার জন্য কোন প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন তাহাদিগকে থামাইয়া দেওয়ার জন্য উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারকার্য এক অভিনব কৌশল। সোভিয়েত দেশের অতিথি হইয়া ইহাদের অতিথিপরায়ণতায় বহুবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী খাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন এ দেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নাই। চক্ষু মেলিয়া যাহারা সত্যকে অস্বীকার করেন আল্লাহ্ যেন তাহাদের ক্ষমা করেন।" ('যে দেশে মানুষ বড়' পৃষ্ঠা ৬১, ৬২, ৬৩)

নারীরা স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজেই

সমাজতন্ত্র সবসময় নারী-পুরুষের সমানাধিকার চায়। সমাজতন্ত্র নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যের বিরোধী, শুধুমাত্র নারী হবার কারণেই কোনো মানুষের অধিকারগুলোকে সীমাবদ্ধ করা বা সমাজে তার ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়ার বিরোধী। কারণ তা জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্যের মতোই বৈষম্যমূলক। সমাজতন্ত্র কোনোরকম বৈষম্যকে সমর্থন করে না।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে রাশিয়ায় নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? বিপ্লবের পরে তাদের ব্যাপারে

রাষ্ট্র কী উদ্যোগ নিয়েছিল? ১৯২০ সালে রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিন ক্লারা জেটকিনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "কেমন করে নারীরা ক্ষুদ্র, একঘেয়ে ঘরকন্নার কাজে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তাদের শক্তি এবং সময় বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়, তাদের মন সংকীর্ণ ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, তাদের নিঃশ্বাস মন্থর হয়ে আসে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তা দেখেও পুরুষরা নারীদের নীরব আত্মদান ভোগ করে আসছে। এরচেয়ে সংকীর্ণ মনের বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?" এই সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তাও লেনিন স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের মধ্যে নিয়ে আসছি। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত – যাতে তারা তাদের জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা ও সামাজিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। আমরা যৌথ রন্ধনশালা, সাধারণ খাবারঘর, ধোপাখানা ও মেরামতের দোকান, শিশুদের রাখবার জায়গা, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, শিশুদের খেলাঘরসহ সমস্ত রকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। সংক্ষেপে, আলাদা আলাদা ঘরকন্নার অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মগুলোকে সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করার কর্মসূচি আমরা গুরুত্বের সাথে কাজে পরিণত করছি। তার অর্থ দাঁড়াবে সাবেকি রান্নার একঘেয়েমি থেকে ও পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা থেকে নারীর মুক্তিলাভ। তার দ্বারা নারীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের প্রতিভা, ক্ষমতা ও আগ্রহ কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। শিশুরাও বাড়ি অপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থায় মানুষ হবে। আমাদের নারী শ্রমিকদের জন্য যে রক্ষামূলক আইন আছে তা পৃথিবীর অন্যসব দেশের আইনের চেয়ে বেশি অগ্রগামী।"

ঘরকন্না ও বাচ্চা লালন-পালনের কাজকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়ে এসে নারীদের বিকশিত হওয়ার যে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন – বিশ্বের কোনো পুঁজিবাদী দেশ তখন কেন, আজও ভাবতে পারে না। সমাজতন্ত্র নারীর কাজের ক্ষেত্র, সামাজিক অধিকার, মজুরি – সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্য দূর করেছিল।

নারীদের স্বাধীনতা দিলে, সমানাধিকার দিলে সমাজ রক্ষা করা যাবে না, সমাজে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে, নোংরামি শুরু হয়ে যাবে – এই চিন্তা অনেকের মধ্যেই আছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ছেলেমেয়েরা নোংরামি করতো – এরকম ধারণাও সমাজে বিদ্যমান। বাস্তব সত্যটা কী?
বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া ছিল একটা অধঃপতিত স্থান। পতিতাবৃত্তিতে যুক্ত ছিল একটা বড় সংখ্যার নারী। এমন কি বিপ্লবের চার বছর পরও ১৯২১ সালে দেখা গেল সারা দেশেই পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপ্লবের পর ১৪টি দেশের একসাথে রাশিয়া আক্রমণ, তাদের রুখতে গিয়ে দেশে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট – এ সবকিছু মিলিয়ে দেশে বেকারের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আর এই বেকারদের তিনভাগের দুইভাগ ছিলেন নারী। এই অবস্থা চলল আরও দু'বছর।

১৯২৩ সাল থেকে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল। কিন্তু সেটা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো অভিযান চালিয়ে পতিতাদের গ্রেফতার করা নয়। একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করে পতিতাদের দেয়া হল। সেই প্রশ্নপত্র তৈরিতে ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। নারী কেন এই জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয় – এই প্রশ্নে এইরকম গণনিরীক্ষা এর আগে আর কোথাও হয়নি। এই নিরীক্ষা থেকে এমন সকল বিষয় বেরিয়ে আসল যাতে এই পেশা সম্পর্কে সাধারণত সমাজে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা ভেঙে গেল। প্রচলিত ধারণা হল – পতিতারা চরিত্রহীন, মেয়েদের চরিত্র ঠিক না করলে এ অবস্থা পাল্টানো যাবে না; মানুষই পতিতাবৃত্তির জন্য দায়ী, তারা ঠিক না হলে কিছু হবে না; শ্রমজীবী মহিলারাই এজন্য বেশি দায়ী, মেয়েদের বাইরে কাজ করতে যাওয়া বন্ধ করা উচিত; ধর্মহীনতার কারণে সমাজে এসব সৃষ্টি হচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত ইত্যাদি।
বাস্তবে এই সংকটের মূল হলো আরও গভীরে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জানতেন, এরকম ভাসা ভাসা ধারণা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান ঘটবে না। তবে যত কারণই থাকুক না কেন একটা বিষয় স্পষ্ট ছিল যে, মেয়েদের জীবিকা অর্জনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। মর্যাদাপূর্ণ কাজ পেলে কেউই অমর্যাদার জীবন বরণ করবে না। ১৯২৫ সালে যখন পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে কমসূচি নেয়া শুরু হলো

তখন সারাদেশে কর্মক্ষেত্র থেকে মেয়েদের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলো, তাদের জন্য স্কুল, ট্রেনিং সেন্টার খোলা হলো, কো-অপারেটিভ ফ্যাক্টরি ও কৃষিখামারে তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হলো। একইসাথে পতিতাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক সকল আইন বাতিল করা হলো। কিন্তু যারা এই ব্যবসা করবে ও এ থেকে মুনাফা লুটবে – তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইন চালু করা হয়েছিল।

এবার পতিতালয়গুলোতে অভিযান পরিচালিত হলো। কিন্তু সেটা একেবারে নতুনরূপে। ডিক্রি জারি হলো, পতিতাদের উপর কোনো দমন-পীড়ন চালানো হবে না। তাদের গ্রেফতার নিষিদ্ধ করা হলো। অভিযানের দলে যারা যাবেন, তাদের বলা হলো, পতিতারা খারাপ আচরণ করলেও তাদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। বলা হলো, 'আপনাদের মনে রাখতে হবে এরা মুনাফাখোরদের অসহায় শিকার।' এমনকি পতিতাদের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত নিতে নিষেধ করা হলো।

মানুষের মধ্যে নৈতিকতার জাগরণ ঘটানোর জন্য পদক্ষেপ নেয়া হলো। প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হলো – 'যদি নারীকে শোষণ করে বাঁচা জঘন্যতম অপরাধ হয় তাহলে নারীর সম্মান ক্রয়ও কি সমান অপরাধ নয়?' সমাজতন্ত্রে নারী-পুরুষের প্রেমের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা দূর করা হয়েছিল। যেকোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে তাদের পছন্দ অনুসারে পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারত, বিয়ে করতে পারত। তাদের যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া তখনও শেষ না হয়, যেহেতু সেখানে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্পূর্ণ আবাসিক, সেক্ষেত্রে আবাসিক হোস্টেলে তাদের একত্রে থাকার ব্যবস্থা করা ও সন্তান হলে তাকে দেখাশোনা করার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিশ্চিত করা হয়েছিল। যে সমাজে স্বাভাবিকভাবেই জীবনের সবকিছু পাওয়া যায়, সেখানে এইভাবে অধঃপতিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

আরও বহুরকম পদক্ষেপ নিয়েছিল রাশিয়া। আমরা এই লেখায় তার বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারব না। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা ছিল একইসাথে মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক। পুরুষতন্ত্রের সমস্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই করে সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ ছিল পৃথিবীর একমাত্র সেনাবাহিনী যারা সিফিলিস, গনোরিয়াসহ বিভিন্ন যৌনরোগ থেকে মুক্ত ছিল। নারীর মর্যাদা সমুন্নত রাখা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং সারাদেশে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করতে পেরেছিল – এদেশে আর কোনো পতিতা নেই। সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কি বাস্তবসম্মত?

সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতির বদলে পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু করেছিল। এই কারণে ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ১৯৮৯ সালে তা ভেঙে যাওয়ার সময় পর্যন্ত একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্র কখনোই মন্দায় হোঁচট খায়নি। সমস্ত কর্মক্ষম জনগণের পূর্ণ কর্মসংস্থান দিতেও ব্যর্থ হয়নি। কোনো পুঁজিবাদী দেশে এরকম কখনও ঘটেনি। একসময় না একসময় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো মন্দায় আক্রান্ত হয়-ই। জনগণের পূর্ণ কর্মসংস্থান আজকের যুগে কোনো পুঁজিবাদী দেশই করতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ৫৬ বছর (১৯২৮ - ১৯৪১ ও ১৯৪৬ - ১৯৮৯; যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক এবং তারা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না) তাদের অর্থনীতির বিকাশ ছিল মার্কিন অর্থনৈতিক বিকাশের চেয়েও দ্রুততর।

বেকারত্ব নেই, অর্থনৈতিক বিকাশের গতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততর – এই মানদণ্ড দিয়ে সোভিয়েত অর্থনীতি সম্পর্কে একটা ধারণা নেয়া যায়। কিন্তু যে প্রশ্নটা এর মধ্যেও ঘুরে ফিরে আসে তা হলো – 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ মার খায় কারণ ব্যক্তিগত উৎপাদনের

স্বীকৃতি সেখানে নেই। ব্যক্তিগত সকল উদ্যোগ ও উৎপাদনই রাষ্ট্রের তহবিলে জমা হয়। ব্যক্তিভেদে উদ্যোগ, ক্ষমতা ও যোগ্যতার যে পার্থক্য হয় – তাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। যে সবচেয়ে ভাল কাজ করে ও যে সবচেয়ে খারাপ করে – দু'জনকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়।'

কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন দেয়া হত আর কোথাও এমন দেয়া হত বলে আমাদের জানা নেই। এটা আমাদের সোভিয়েতভক্তির কথা নয়। এই কথাটার পেছনে কিছু যুক্তি আছে। আমরা যে সমাজে বাস করি, এই পুঁজিবাদী সমাজে প্রত্যেকেই তার জীবন নির্বাহের জন্যই কাজ করে। কারণ কাজ না করলে টাকা আসবে না, টাকা না আসলে খাবার, থাকার জায়গা, শিক্ষা, চিকিৎসা – কোনো কিছুই সে পাবে না। সেজন্য তার খাটুনিটা হলো রোজগারের জন্য। তাকে খাটায় কে? সমাজ যেহেতু ব্যক্তিমালিকানাব্যবস্থায় পরিচালিত, উৎপাদন যেহেতু ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে হয় – তাই একজন মানুষের শ্রম যে মূল্য উৎপাদন করে তার কিছুটা অংশ তাকে দিয়ে বাকিটা পুঁজির মালিক মুনাফা হিসেবে নিয়ে নেয়। কিন্তু মালিক চায় সর্বোচ্চ মুনাফা। তার জন্য সে আরও শ্রম বের করে নিতে চায়, মানুষের সমস্ত সৃষ্টিশীল গুণগুলোকে কিনে নিতে চায়। সেজন্য সে পুরস্কার দেয়। বেতনের সাথে অতিরিক্ত টাকা দেয়, কখনও লাভের অংশও দেয় – কিন্তু সবই সে করে পুরো শ্রমটা নিংড়ে বের করার জন্য।

শ্রম দেয়ার ক্ষেত্রে কখনও ঘাটতি হলে বা সামান্য অকার্যকারিতা দেখলে বা একজনের চেয়ে আরেকটু দক্ষ আরেকজন একই বেতনে পেলে – মুহূর্তেই একজনকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতে এই ব্যবস্থায় কোনো মালিকের বাধে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফারাকটা হল এই যে, পুঁজিবাদে উৎপাদনের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে – ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে – সকল উৎপাদনের মূলে এবং প্রধান উপাদান হলো শ্রম। পুঁজিবাদ এই বিষয়টিকে আড়াল করতে চায়। তাই উৎপাদনের মালিকানা নির্ধারণ করার প্রশ্নে পুঁজিবাদ পুঁজির মালিককেই উৎপাদিত পণ্যের মালিক বলে ঘোষণা করে। অথচ একটা বস্তু কাঁচামাল থেকে পণ্যে পরিণত হয় শ্রমের কারণে। শ্রমই মূল্য তৈরি করে। পুঁজির মালিক শুধু পুঁজি খাটিয়ে, কোনোরকম শ্রম না করে শ্রমের ফলের প্রায় সবটুকুই ভোগ করে। আর যারা নিরন্তর শ্রম দিয়ে পণ্য সৃষ্টি করল, মূল্য তৈরি করল – তাদেরকে মালিক ততটুকুই দেয় যতটুকু না পেলে শ্রমিক তার শ্রম দেয়ার ক্ষমতাও হারাবে। পুঁজি ও শ্রমের এই দ্বন্দ্বে সমাজতন্ত্র ঘোষণা করে যে, পণ্যের মালিকানা তারই হবে যে শ্রম দেয়। সকল উৎপাদনই যেহেতু আজ সামাজিক, শুধু মালিকানাটা ব্যক্তিগত এবং সেটা পুঁজিবাদ অবস্থান করার কারণে – তাই সমাজতন্ত্র ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ চায়। চায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো শ্রমিক নয়, সামাজিকভাবে গোটা শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত উৎপাদনের মালিক হবে। এই কথায় পুঁজিবাদী সমাজে কান্নার রোল ওঠে – 'হায়! সমাজতন্ত্র আসলে আমাদের সব সম্পত্তি চলে যাবে।'

এখন কেউ যদি বলে 'আমি নিজে সম্পত্তি অর্জন করেছি' তাদেরকে আমরা ভেবে দেখতে বলব – এমন কোনো সম্পত্তির কথা আপনারা বলতে পারবেন কি যেটি আজকের এই সময়ে কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দিয়ে তৈরি হতে পারে? এর উত্তর হলো – না। আর এই সম্পত্তি যদি হয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের পুঁজি, তবে এও জেনে রাখা উচিত যে, এই পুঁজি কখনো এককভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। এই পুঁজি একটি যৌথ সৃষ্টি, তা তৈরি হয়েছে বহুসংখ্যক লোকের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। সুতরাং পুঁজি কোনো ব্যক্তিগত শক্তি নয়, এটি একটি সামাজিক শক্তি। তাই পুঁজিকে যখন সাধারণ সম্পত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় তখন তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না – সামাজিকভাবে উৎপাদিত সম্পদ তার সামাজিক চরিত্রটা পায়। যেটা তার হওয়াই ন্যায্য। অর্থাৎ আগে যেটা ছিল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণির করায়ত্তে, তার মালিকানা চলে যায় শ্রমজীবী মানুষের হাতে, যারা এই সম্পদের স্রষ্টা। এখন এই প্রশ্ন যদি ওঠে যে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু সকলের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কাজের নিশ্চয়তা থাকে তাহলে কাজ করার অনুপ্রেরণা বা প্রয়োজনীয়তা সে কোথা থেকে পাবে? প্রতিযোগিতা না থাকলে আরও বেশি কাজ সে কেন করবে?'

আমাদের উপরের আলোচনা থেকেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে একজন কাজ করবে এই কারণে যে, সে জানে এই উৎপাদন তার জন্যই, এর মালিক সে-ই। আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা যেমন জীবন নির্বাহের জন্য কাজ করি, আরেকটু টাকা আসবে বলে আরেকটু বেশি খাটি, তাতে কাজে থাকে না কোনো আনন্দ, কিছুদিন পরপরই আসে বিরক্তি, আসে হতাশা। কোনো সৃষ্টিশীল কাজও করি আসলে তা বিক্রির জন্য। আমার কাজ কোথায় কীভাবে ব্যবহার করলে ভাল হবে – সে ব্যাপারে বলার আমার কোনো সুযোগ থাকে না। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এ লিখেছিলেন, 'বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হলো স্বাধীন এবং নিজস্ব সত্ত্বাবিশিষ্ট, আর জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন আর তার নিজস্ব কোন সত্ত্বা নেই।' কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপারটা এমন হয় না। সমস্ত উৎপাদনের উপর শ্রমিকশ্রেণির কর্তৃত্ব তাকে কাজের মর্যাদা দেয়, এটা যে তার নিজের কাজ এই বোধ তৈরি করে। নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজন থেকে মানুষকে সামাজিক প্রয়োজনের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। সামাজিক প্রয়োজনই তখন তার সামনে কাজের অনুপ্রেরণা তৈরি করে।

এই বলেও আপত্তি তোলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ ঘটলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সর্বব্যাপী আলস্য এসে গ্রাস করবে সমাজকে। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর ভাষায়, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটালে আলস্য আসবে একথা সত্য হলে নিছক আলস্যের জন্যই বর্তমান এই সমাজের জাহান্নামে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ এখানে যারা দিন-রাত খাটে তারা কিছুই পায় না আর যারা কিছু পায় তারা কাজই করে না।' সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক জানে সে যা উৎপাদন করছে তা তার জন্যই করছে। সে এই দেশটার মালিক। কোনো উৎপাদনই এখানে কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগানোর উপায় নেই। আর পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক জানে নিরন্তর খেটেও সে কিছুই পাবে না। তার সকল শ্রম আত্মসাৎ করবে মালিক।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজের উদ্দেশ্যই হলো সমষ্টির কল্যাণ। কথাটা শুনতে অবাস্তব লাগলেও এটা ঠিক এবং এই চিন্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট জনগোষ্ঠী ধারণ করতো। তারা মনে করতো তাদের কাজের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। গোটা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণি তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। তারা তাদের সময়কে এমনি এমনি নষ্ট করতে পারে না। শুধুমাত্র একধরনের কাজ করেই তারা তুষ্ট থাকতে পারে না। তাদের সবকিছুই শিখে নেয়া দরকার। পুঁজিবাদ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে চায় আর সমাজতন্ত্র চায় সামগ্রিকভাবে শিক্ষিত একজন মানুষ। এই মানুষ তখন শুধু জীবিকা নির্বাহ করে তা নয়, অবসরের পরেও তার জীবন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের একটা তৃপ্তি আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সময়ে বৃত্তি নিয়ে একজন যেতে পারত তাঁতের কাজ শিখতে। শিক্ষা শেষে দেখা গেল তাকে রাশিয়ার বয়নবিভাগে নিয়োগ দেয়া হলো। সেখানে কাজ করতে হবে ৬ ঘণ্টা। এর মধ্যে চার ঘন্টা প্র্যাকটিক্যাল ও দু'ঘন্টা থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং নিতে হবে। এই বিভাগের পাঠ্য যখন শেষ হবে তখন পাঠানো হবে অন্য বিভাগে। কটন মিল থেকে লোহার কারখানা, লোহার কারখানা থেকে ওষুধ কারখানা। এমনি করে বৃদ্ধ বয়সে পেনশন নিয়ে যখন সে ঘরে ফিরে, যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে, তাতে যেকোন লোকের গর্ব হবে। এই ধরনের অভিজ্ঞ লোক রাশিয়া ছাড়া সে সময় পৃথিবীতে বিরল ছিল।

রাশিয়াতে যে এমন উদ্যোগী-সৃষ্টিশীল কাজ করত, রাষ্ট্র তার যথার্থ মূল্য দিত। তেমনি একটি ঘটনা, মারি দেমচেঙ্কো নামে এক মেয়ে একর প্রতি বীট উৎপাদন বাড়িয়ে রেকর্ড করেছিল, স্তাখানভ নামে এক কয়লা শ্রমিক কয়লা উৎপাদনেও একই কাজ করেছিল। এইরকম বীরদের নাম পত্রিকায় ফলাও করে আসত। স্তাখানভের নামে তো উৎপাদন বাড়ানোর একটা আন্দোলনই শুরু হয়ে গেল। যার নাম 'স্তাখানোভাইট মুভমেন্ট'। আর পুরস্কার? রাশিয়ার কর্মবীরেরা নিজের কাজের শ্রেষ্ঠত্বের বিনিময়ে অর্থ পুরস্কার চাইতে ঘৃণা বোধ করতো। তাদের পুরস্কার ছিল উচ্চতর স্কলারশীপ, যে বিষয়ে তারা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে সে বিষয়ে আরও যোগ্য হওয়ার জন্য।

এরকম সৃষ্টিশীল কাজ পেলে মানুষ হৃদয় ঢেলে করে। আনা লুই স্ট্রং নামে একজন মার্কিন

সাংবাদিকের লেখা 'স্তালিন যুগ' বইয়ে তার একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন। লেখিকার সাথে বিল স্যাটফ নামে এক ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক সোভিয়েতের নন, বাইরের দেশ থেকে এসেছেন টাকার বিনিময়ে রেলপথ তৈরির কাজে। কিন্তু এসে প্রচণ্ড উদ্বুদ্ধ হলেন। একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার শ্রমিকের দেশ গড়ার জন্য এমন পরিশ্রম তিনি আগে দেখেননি। তিনিও পাগলের মতো খাটতে লেগে গেলেন। খেটে খেটে অসুস্থ হলেন। চোখ খারাপ হয়ে গেল। তাঁর সাথে দেখা করতে আনা লুই স্ট্রং গেলেন হোটেলে। বললেন, "স্ত্রীকে নিয়ে আসুন না। একটু ভাল থাকতে পারবেন। নিয়মিত খাওয়া, বিশ্রাম হবে তাহলে।" বিল তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, "জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কাজ। ঠিক কাজ নয়, সৃষ্টি। এই যে সময়টাতে আমরা বেঁচে আছি, এ সময়ে অন্তহীন, সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে সৃষ্টি করার। স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বা সময় মতো খেতে আসার জন্য এ সময়ের একটা ঘণ্টাও নষ্ট হতে দেয়া যায় কি?"

এই বিলের কাজের মূল্য কত টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে? একজন বিল কিংবা গোটাকয়েক বিল যদি এমন বলতেন তাহলে ধরে নেয়া যেত যে কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এরকম উদাহরণ তো ভুরি ভুরি। এটাই তো সত্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সাড়ে তিন বছরেই, দ্বিতীয়টি চার বছরে। সবই কি বিভ্রান্তি? যুক্তিহীন মোহ?

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটল কেন?

১৯১৭ সালের আগে দুনিয়ায় কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব ছিল না। রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণি বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে কেরেনস্কি সরকারকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে। আমেরিকা হতে প্রায় ১০০ বছর পিছিয়ে থাকা রাশিয়ায় ঘুমন্ত জনতাকে এ বিপ্লব জাগিয়ে তোলে। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে ছিল ৭২ বছর। প্রশ্ন ওঠে, সমাজতন্ত্র যদি এত ভালো ব্যবস্থা হয় তাহলে তার পতন ঘটলো কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের স্মরণ করতে হবে মার্কসবাদী চিন্তানায়কদের শিক্ষাকে। মহান মার্কস-লেলিন আমাদের শিখিয়েছেন, সমাজতন্ত্র স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নয়, এটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে শোষণহীন সমাজব্যবস্থায় পৌঁছানোর মধ্যবর্তী স্তর হলো সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রে শ্রেণির বিলুপ্তি ঘটে না। গুটিকয়েক পুঁজিপতি বিরাট অংশের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। এই কয়েকজন পুঁজিপতিদের হাতেই গচ্ছিত থাকে সমাজের সমস্ত সম্পদ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এই ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সকল রকমের ব্যক্তিমালিকানা এক ধাক্কায় উচ্ছেদ করা যায় না। এই মধ্যবর্তী স্তরের কাজটি করে সমাজতন্ত্র। ছোট ছোট পুঁজির মালিক তখনও থেকে যায়, থেকে যায় অনেকের মধ্যে মালিক হওয়ার ইচ্ছাও। অন্যদিকে ক্ষমতা হারানো পুঁজিবাদী শক্তি আবার রাষ্ট্র ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য নানা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চালায়। তাই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তার দেশের জনগণের মধ্যে চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে ক্রমাগত উন্নত করার আপ্রাণ সংগ্রাম জারি রাখতে হয়। অন্যদিকে ধাপে ধাপে সকল বৈষম্য দূর করে সম্পূর্ণ সামাজিক মালিকানার অর্থনীতির দিকে দেশকে নিয়ে যেতে হয়। সেই সাথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দুনিয়ার দেশে দেশে শোষিত মানুষের সংগ্রামে সহায়তা করতে হয়। এভাবে একদিন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জাতিতে জাতিতে দেশের সীমানা তুলে দিয়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে এক জাতি হিসাবে মানবজাতির নতুন সমাজ শুরু হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদ।

তাই পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌঁছাতে চাই জনগণের সাথে সেই দেশের বিপ্লবী পার্টির সচেতন সংগ্রাম। আবার পার্টির অভ্যন্তরে নেতা-কর্মী-সমর্থক-জনগণকে সাম্যবাদী সমাজের চেতনায় পরিচালনা করতে হয়। এ সংগ্রামকে বলা হয় 'আদর্শগত সংগ্রাম'। এ সংগ্রাম অবহেলিত হলে, দুর্বল হলে একদিনের আপোষহীন বিপ্লবী, অসমত্যাগী নেতাও অধঃপতিত হয়। কর্মী-সমর্থকরা বিপথগামী হয় এবং দল ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নানা সুবিধাবাদী ও আপোষকামী প্রবণতা দেখা দেয়।

ফলশ্রুতিতে একদিনের মহান আত্মত্যাগের সংগ্রামের বিপ্লব আবার মুখ থুবড়ে পড়ে। পতন ঘটে পুরো ব্যবস্থার। ফিরে আসে সেই কদর্য দুর্নীতি, ব্যক্তি সম্পদ জমানোর প্রবণতা, লোভের মানসিকতা ইত্যাদি পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য। এভাবেই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আবার পুঁজিবাদে ফিরে আসতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষই জানে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটেছে ১৯৯১ সালে। বাস্তবে সোভিয়েত রাশিয়ায় এই পতনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৫৬ সাল থেকে। ১৯১৭ সালে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব হলো, তাঁর মৃত্যুর পর মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও সাফল্যের সাথে সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘোষণা করে। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করে যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যদিও শুরুতে তা স্পষ্ট হয়নি কিন্তু কালক্রমে সমাজতন্ত্রের মৌলিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই রাশিয়ায় আবার ১৯৯১ সালে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রকে আরো উন্নত রূপে প্রতিষ্ঠিত করে সাম্যবাদের দিকে নিয়ে যাবার বদলে সোভিয়েত রাশিয়ায় পুঁজিবাদ ফিরে এসেছে। এমন আশঙ্কার কথা মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদেরা অনেক আগেই ব্যাক্ত করেছেন।

আজ যারা দুনিয়াতে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়ছে তাদের সামনে আছে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুতির শিক্ষা। পুরো দুনিয়ার এই পুঁজিবাদী দুঃশাসন থেকে রক্ষা পেতে হলে মানবজাতিকে এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন লড়াই সূচনা করতে হবে। অনেকে বলেন, সোভিয়েত রাশিয়ার মৃত্যু ঘটেছে, এখন আর সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করে লাভ কী? এর উত্তর হলো, সমাজতন্ত্র হলো একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। কোনো একটি দেশে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হলেই এই বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ ব্যর্থ হয় না। যেমন ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে রোগী মারা গেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না।

পুঁজিবাদ নয়, সমাজতন্ত্রই মানবমুক্তির পথ

সমাজে ধনী-দরিদ্র কার সৃষ্টি? ক্ষুধার কারণে মানুষ মরছে কেন? আজ কোটি যুবক বেকার কেন? এরকম অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে পুঁজিপতিরা মুখস্থ করাতে চায় একটি কথা, 'এসবই ভাগ্যের ফল'। অথবা প্রচার করে – 'তুমি চেষ্টা করলেই পারবে।' আসলে কি ব্যাপারটা তাই? চেষ্টা করলেই কি পারা যায়? লক্ষ-কোটি মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা কি এজন্য যে তারা ঠিকমত চেষ্টা করছে না? প্রাণপণ চেষ্টা যদি প্রত্যেকেই করে তবে সকল বেকারদেরকে কি রাষ্ট্র চাকরি দিতে পারবে? পারবে না। এ শুধু আমাদের দেশের ঘটনাই নয়। গোটা বিশ্বে মানবজাতি আজ ভয়াবহ সংকটে আছে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, বিভেদ বাড়ছেই। বাড়ছে জাতিগত, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। এর কোনো সমাধান পুঁজিবাদী দুনিয়া দিতে পারছে না। একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মের কারণেই পুরো দুনিয়ায় আজ ক্ষুধা, দারিদ্র, যুদ্ধ, অনাহার ও বেকারত্ব চলছে। আজকের এই সময়ে বিদ্যমান সকল সংকটের মূল কারণ হলো এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারলে পুঁজিবাদ টিকতে পারবে না। মুনাফার লোভে এই ব্যবস্থা যুদ্ধ লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করে, নারীর শরীর নিয়ে কোটি টাকার সেক্স ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলে, প্রযুক্তির শক্তিতে মানুষের সকল গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকে সীমায়িত করে, ব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বকে মেরে দিয়ে মুনাফার লালসা জাগায়, মানুষকে করে আত্মমগ্ন-স্বার্থপর, সমষ্টির স্বার্থের বিরোধী।

আমরা শুরু করেছিলাম একটা প্রশ্ন নিয়ে – এই সীমাহীন দুঃখের অবসান ঘটবে এমন কোনো সমাজ সৃষ্টি হতে পারে কি? সৃষ্টি করা যে সম্ভব- এমন কথা বইয়ের কথায় নয়, বাস্তবের আঙিনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিকাশ ঘটিয়েছিলেন কমরেড স্ট্যালিন। এর গৌরবের অনেক কথাই এ ছোট পরিসরে বলা সম্ভব নয়। যেসব বিভ্রান্তি সমাজতন্ত্রকে নিয়ে আছে আমরা সেগুলোই শুধু স্পর্শ

করে গেলাম। কিছু উদাহরণও আসলো তার হাত ধরে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, খেলাধুলায়, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যশিল্পে – এমন যত যত বিভাগ আছে সকল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অবদান বিরাট ও ব্যাপক। আমরা সে আলোচনার দরজাকে দূর থেকে আবছা দেখিয়ে গেলাম। উৎসাহীরা দরজার কাছে যাবেন, সমাজতন্ত্রের মহত্ত্বের সময়টাতে প্রবেশ করবেন।

আজ পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে নেই। কেন নেই, সেটা আরেক আলোচনা। কিন্তু নেই-টাকেই বারবার মানুষ স্মরণ করছে তার যাবতীয় সমস্যা সংকটে, স্মরণ করছে মুক্তির পথ হিসেবে। মানুষ বুঝতে পারছে কিছু সংখ্যক লোকের কাছে আজ গোটা পৃথিবী জিম্মি হয়ে আছে। খোদ আমেরিকার বুকে ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন ঘোষণা করেছে সেই বার্তা।

আবারও সমাজতন্ত্র আসবে শোষণের জোয়াল কাঁধ থেকে নামাতে। তিরিশের দশকে রাশিয়ার স্তাখানোভাইট আন্দোলনের এক কর্মী উৎপাদন বাড়ানোর সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "আজ থেকে দশ বছর পরে শিল্প ও কৃষি আর আমাদের প্রধান কাজ থাকবে না হয়তো। আমাদের যা কিছু দরকার সবই আমরা প্রস্তুত করতে পারব। তবে অন্য ধরনের কাজও তো আছে। মানবিক বিকাশ, নতুন দেশের সন্ধান, বিজ্ঞান – এগুলোর তো কোনো অন্ত নেই।" এই অন্তহীন জ্ঞানের জগতে এতদিনে হয়তো প্রবেশ করতো রাশিয়ার শ্রমিক। হয়তো গোটা বিশ্বের শ্রমিকরাই করতো। কোনও একদিন করবেও। মানুষের বিকাশের কোনো সীমা মানতে রাজি ছিল না তারা। এর কষ্টকর পথচলাকে তাই কোনোদিন তারা ভয় পায়নি। তারা বিশ্বাস করতো এই আদর্শের মহান উদগাতা কার্ল মার্কসের সেই অমর উক্তিতে, "বিজ্ঞানের পথে কোনো সহজ রাস্তা নেই। যারা এর খাড়া পথের কষ্টকর আরোহণকে ভয় পায় না, তারাই এর আলোকোজ্জ্বল চূড়ায় পৌঁছতে পারবে।"

তথ্যসূত্র:

১. কমিউনিস্ট ইশতেহার– কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।
২.স্ট্যালিন যুগ – আনা লুই স্ট্রং।
৩. যে দেশে মানুষ বড় – জসীম উদ্‌দীন।
৪. মানুষের সমাজ – আনু মুহাম্মদ।
৫. 'দর্শক' – নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ সংখ্যা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৬. নারীমুক্তির পথদিশা সোভিয়েত সমাজতন্ত্র – বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র।

■ ■ ■

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট | কেন্দ্রীয় কমিটি, ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০
ফোন : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭৫৭-৮০৮৭৮১ ই-মেইল : studentfornt1984@gmail.com
প্রচ্ছদ : রাগিব সাফায়েত **মূল্য : ৫ টাকা**